سُورَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثُونَ اٰيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

قَدِيْرُ ۟ۙ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ

عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۟ۙ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ

تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ

الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا

بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ

عَذَابَ السَّعِيْرِ ۟ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۟ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ

تَفُوْرُ ۟ۙ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ

خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۟ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا

وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۟

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۟

সূরা আল-মুলক

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৩০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (৩) তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফিরাও ; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি ; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। (৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? (৯) তারা বলবে ঃ হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। (১০) তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।

সূরা আল-মুলক

সূরা মুলকের ফযীলত ঃ এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। ওয়াকিয়া শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং মুনজিয়া শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر অর্থাৎ, এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এ সূরা পাঠ করে, তাকে এ সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।—(কুরতুবী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে গ্রথিত থাকুক। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কেয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে ; সেটা সূরা মুলক।—(কুরতবী)।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ - تَبٰرَكَ

برکت —থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। بِيَدِهِ الْمُلْكُ —আল্লাহ্ তাআলার হাতে রয়েছে রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে হাত অর্থে يد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু উর্ধ্বে। তাই এটা একটা متشابه শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ কারও জানার বিষয় নয়। এর রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হওয়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে চারিটি গুণ দাবী করা হয়েছে। (এক) তিনি বিদ্যমান আছেন। (দুই) তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার উর্ধ্বে। (তিন) তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং (চার) তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ দাবীর যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টজীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরে আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টবস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে খোদায়ী কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে ঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ —এরপর কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে, الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ —এরপর هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا থেকে দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শূন্যমণ্ডলে বসবাসরকারী সৃষ্টজীব পক্ষীদের উল্লেখ করে اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফেরদের শাস্তি, মুমিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দু'টি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের স্বরূপ ঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ, তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দু'টি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্যে সৃষ্টি শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যতঃ নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব, একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় না; বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দু'টি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান। বাহ্যতঃ একটি সহীহ্ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে যবাই করে ঘোষণা করা হবে ঃ এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কেয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কেয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে যবাই করা হবে।—(কুরতুবী)।

তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিছক নাস্তি নয়; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তিত্ব লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার জড়-অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে-মিছালে' (সাদৃশ জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে-সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিলাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তফসীরে-মাযহারীতে 'আলমে-মিছাল' প্রমাণ করার উদ্দেশে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর ঃ তফসীরে-মাযহারীতে আছে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে খোদায়ী আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে কিন্তু মানুষ খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে তা বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ —অর্থাৎ, কাফেরকে মৃত এবং মুমিনকে জীবিত আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, কাফের তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে,

وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ —এখানে জীবনের অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে; যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই ধরনের জীবন নেই। তাই আল্লাহ্ তাআলা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন ঃ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ —কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড়পদার্থের মধ্যেও অস্তির জন্যে অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ —অর্থাৎ, এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা-কীর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলতঃ মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্বলাভ করে—এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। একথাও বলা যায় যে, পরবর্তী لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ্ তাআলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনের সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى অর্থাৎ, মৃত্যু উপদেশের জন্যে এবং বিশ্বাসই ধনাঢ্যতার জন্যে যথেষ্ট।—(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের হওয়া সুদূর পরাহত। আল্লাহ্ তাআলা যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আস (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্যে যথেষ্ট।

أَحْسَنُ عَمَلًا এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমি দেখতে চাই, তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেননি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ্ তাআলার কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কর্মটি ভাল, নির্ভুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কেয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না; বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন একটি কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াতে তেলাওয়াত করতঃ أَحْسَنُ عَمَلًا পর্যন্ত পৌঁছে বললেন ঃ সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহ্ তাআলার হারামকৃত বিষয়াদি থেকে

الملك ٦٧ ٥٦٣ تبارك الذى ٢٩

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُّوا
قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ
مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ
الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ
يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا
إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ
يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾
أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَجُّوا
فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ
أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

(১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (১৬) তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। (১৭) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। (১৮) তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয় দেখেন। (২০) রহমান আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত তোমাদের কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেররা বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে।। (২২) যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে?

সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য করার জন্যে সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।—(কুরতুবী)।

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ — এই আয়াত থেকে বাহ্যত ঃ জানা যায় যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্যমণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটা ও জরুরী হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নয়। যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।—(বয়ানুল-কোরআন)।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ

مصابيح—বলে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজির দ্বারা সুশোভিত করার জন্যে এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে ; বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্যে অঙ্গার করে দেয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন অগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে انقضاض الكوكب বলে দেয়া হয়।—(কুরতুবী)।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্যে শয়তানরা যখন উর্ধ্বগগণে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজি পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বিতাড়িত করে দেয়া হয়।—(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের শাস্তি ও অনুগত মুমিনদের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا — ذَلُولًا এর শাব্দিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে ذلول বলা হয়। مناكب শব্দটি منكب-এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোন জন্তুর কাঁধ আরোহণের স্থান নয় ; বরং কোমড় অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহীর জন্যে নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্যে এমন বশীভূত করে দিয়েছি যে, তোমরা তার কাঁধে চরে অবাদে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে

তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ —আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে বিবরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত রিযিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রফতানি আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা। وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাকে। পরবর্তী আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্ তাআলার আযাব আসতে পারে। এরশাদ হয়েছেঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ, যদিও আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ —অর্থাৎ, তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিষ্ফল হবে। আজ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত জাতীসমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানবসত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ন্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ —অর্থাৎ, তারা কি পক্ষীকুলকে মাথার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে ভারীবস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেয়া এবং তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করা নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়া—এগুলো সব আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ —এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্ তাআলার যে রিযিক পাচ্ছ, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয় ; বরং আল্লাহ্ তাআলার দান ও বখশিস। তিনি তা বন্ধও করে দিতে পারেন। اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাফেরদের জন্যে পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকারীর বর্ণনাও শুনে না। بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ —অর্থাৎ, তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে। অতঃপর কেয়ামতের মাঠে কাফের ও মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের মাঠে কাফেররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কাফেররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ —অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী হেদায়েতপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? শেষোক্ত ব্যক্তিই মুমিন। সে-ই হেদায়েত পেতে পারে।

قُلْ هُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ
الْاَفْـِٕدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي
الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَآ اَنَا
نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ
مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ
تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ
اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

سُوْرَةُ الْقَلَمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾ وَاِنَّكَ
لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾

(২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে? (২৫) কাফেররা বলে ঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে ঃ এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। সত্বরই তোমরা জানতে পারবে, কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।

সূরা আল-কলম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) নূন—শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, (২) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন। (৩) আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) সত্বরই আপনি দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে নিবে। (৬) কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও জ্ঞানের কতিপয় বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ قُلْ هُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ — অর্থাৎ, আপনি বলুন, আল্লাহ্ তাআলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য ঃ আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিন অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্যে নাক আস্বাদনের জন্যে জিহ্বা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা শ্রবণ করার জন্যে কর্ণ এবং দেখার জন্যে চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তাআলা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রে জানা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধায় এখানে পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জ্ঞানের কেন্দ্র এর পক্ষে কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্ককে জ্ঞানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাফেরদের প্রতি হুঁশিয়ারী ও শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর,. তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহ্ তাআলার দান। তিনিই পানি বর্ষণ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পচন রোধ করার জন্যে পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা উপশিরার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেথা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি মৃত্তিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা স্রষ্টার দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ

অর্থাৎ, তারা ভেবে দেখুক, তারা যে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন্ শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে,

এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলা উচিত ..... অর্থাৎ, বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন—আমাদের শক্তি নেই।

সূরা আল কলম

সূরা মুলকে সৃষ্টজগতের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কাফেরদের দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা আল্লাহ্ প্রেরিত পূর্ণ বুদ্ধিমান, পূর্ণজ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত রসূলকে (নাউযুবিল্লাহ্) উন্মাদ ও পাগল বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর সময় তার প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র অঙ্গে ফুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন। এই গোটা ব্যাপারটি কাফেরদের জ্ঞান ও অনুভূতির উর্ধ্বে ছিল। তাই তারা একে পাগলামী আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি ও সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, আরাধনার যোগ্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কারও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন সাথী ছিল না। তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আত্মরক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যান। বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ সাফল্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পাগল বলত। সূরার প্রথম আয়াতসমূহে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ নূন অক্ষরটি একটি খণ্ডবর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের খণ্ডবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

কলমের অর্থ এবং কলমের ফযীলত ঃ এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও মানবের লেখার কলম অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিশেষতঃ ভাগ্যলিপির কলমও বোঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি তাই। এই বিশেষ কলম সম্পর্কে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম আরয করল ঃ কি লিখব? তখন খোদায়ী তকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির তকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ কলম আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি বড় নেয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম তকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীরা লিখে এবং লিখবে। সূরা ইকরার عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতেও এই কলমের উল্লেখ আছে।

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার শপথ করে আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন ঃ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ অর্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন। এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আলেমগণ বলেন ঃ কোরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে وَمَا يَسْطُرُونَ বলে বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু লিখা হয়েছে এবং লিখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ অর্থাৎ, আপনার জন্যে অশেষ পুরস্কার রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামী বলছে, সেটা আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্যে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না —চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোন পাগলকে তার কর্মের জন্যে পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে ঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ এতে রসূলে করীম (সাঃ)- এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ জ্ঞানপাপীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও উন্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্র ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ স্বয়ং কোরআন রসূলে করীম (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ, কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, যেসব শিষ্টাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সত্তায় আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ بعثت لاتمم مكارم الاخلاق অর্থাৎ, আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। — (আবু হাইয়ান)

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ শীঘ্রই আপনিও দেখে নিবেন

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ
فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ
بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا
بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا
يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ
حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾
أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ
قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾

(৭) আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (৮) অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (৯) তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (১০) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, (১১) যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে, (১২) যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ, (১৩) কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত ; (১৪) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে ঃ সেকালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, (১৮) 'ইনশাআল্লাহ্' না বলে (১৯) অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। (২০) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিছিন্ন তৃণসম। (২১) সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, (২৪) অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫) তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল। (২৬) অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল ঃ আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (২৭) বরং আমরা তো কপালপোড়া, (২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? (২৯) তারা বলল ঃ আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। (৩১) তারা বলল ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী।

এবং কাফেররাও দেখে নিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। مفتون শব্দের অর্থ এস্থলে বিকারগ্রস্ত পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পাগল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ ও মহব্বতকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ অর্থাৎ, আপনি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি প্রচারকার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমা পূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে।— (কুরতুবী)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ — আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎকাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। زنيم শব্দের অর্থ পিতৃ পরিচয়হীন জারজ। আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ কাফেরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফের ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেয়া হয়েছে। এরপরও কয়েক আয়াতে এই ব্যক্তির মন্দ চরিত্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ অর্থাৎ, আমি কেয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। ফলে পূর্ববর্তী সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। خرطوم শব্দটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে خرطوم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ, আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। পূর্বের আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর প্রতি মক্কাবাসী কাফেরদের দোষারোপের জওয়াব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নেয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে

তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ্ তাআলা মক্কাবাসীদেরকেও নেয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নেয়ামত তো এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নেয়ামত মক্কাবাসীদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্ দেখতে চান যে, তারা এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কি না এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী ঃ হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান এয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে জুবায়ের-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর "সান আ" থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল। — (ইবনে-কাসীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে - কিতাব। ঈসা (আঃ)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। — (কুরতুবী)

একজন সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্য-শস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকীর- মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নীচে পড়ে যেত;সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ আমাদের পারিবারিক-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর -মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায় বলল ঃ আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকীনদের জন্যে রেখে দিত। অতএব, আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ অর্থাৎ, তারা পরস্পরে শপথ করে বলল ঃ এবার আমরা সকাল-সকালেই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায় এবং পিছনে পিছনে না চলে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, ইনশাআল্লাহ্ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় "ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল একাজ করব" বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ وَلَا يَسْتَثْنُونَ এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দিব না। —(মাযহারী)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে একটি বিপদ হানা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরী ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَهُمْ نَائِمُونَ অর্থাৎ, এই আযাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন। فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ - صريم শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা। صريم এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেইরূপ করে দিল। صريم এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল। — (মাযহারী)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ অর্থাৎ, যারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল ঃ যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল-সকালই ক্ষেতে চল। وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ অর্থাৎ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলতেছিল, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ - حرد শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, গোস্বা দেখানো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হল। যদি কোন ফকীর এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দিবে।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ যখন গন্তব্যস্থলে পৌছে ক্ষেত-বাগান কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল ঃ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গন্তব্যস্থলেই এসেছি; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল ঃ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ — আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ তাদের মধ্যে যে মাঝারী ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ, পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ন এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন? অর্থাৎ, তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তাআলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দিবেন না, অথচ আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয় থেকে পবিত্র। যারা তাঁর পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশী দিয়ে দেন। — (মাযহারী)

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে,আল্লাহ্ তাআলা সকল ত্রুটি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালেম। কারণ, তারা ফকীর-মিসকীনের অংশও হজম করতে চেয়েছিল।

এই মধ্যপন্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপকাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সে-ও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ অর্থাৎ, তারা নিজেদের

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾
كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾
اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾
اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾
اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ
لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ
فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ
عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾
خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ
اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا
الْحَدِيْثِ ۗ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاُمْلِيْ
لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ
مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾

(৩২) সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। (৩৩) শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত! (৩৪) মোত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নেয়ামতের জান্নাত। (৩৫) আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? (৩৬) তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (৩৭) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর (৩৮) তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও? (৩৯) না তোমরা আমার কাছ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (৪০) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের কে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল? (৪১) না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হত। (৪৪) অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে? (৪৭) না তাদের কাছে গায়বের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল।

অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দরুন এই আযাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশ অপরাধে শরীক ছিল।

আজকাল এই বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ অর্থাৎ, প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহগার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকোরোক্তি তওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন।

ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক একটি আঙ্গুর-গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত। —(মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষরূপী আযাবের সংক্ষিপ্ত এবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র আযাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ায় এই আযাব আসার পরও তাদের পরকালের আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে।

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ অর্থাৎ, যারা কেয়ামতের কথা অবিশ্বাস করে, আপনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে "ছেড়ে দিন" কথাটি একটি বাকপদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার এই দাবীও পেশ করা হত, যদি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহ্র কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের এসব কষ্টদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবতঃ তিনি কোন সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আযাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে ঃ আমার রহস্য আমিই ভাল জানি। আমি তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দেই; তাৎক্ষণিক আযাব প্রেরণ করি না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আনার জন্যে অবকাশও হয়। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) কাফেরদের দাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে আযাবের দোয়া করেছিলেন।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ এখানে হযরত ইউনুস (আঃ)- কে صاحب حوت 'মাছওয়ালা, বলা হয়েছে। কেননা, তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন।